SUB: BENGALI (General)

Course Code: BENG-G-CC-T-2

Semester: II

Paper: BENG-G-CC-T-2

Topic: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Teacher: Dr. Chanchal Mandal

Scanned by CamScanner

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী – এই মন্তব্যের আলোকে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী এবং গদ্যশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করো।

Ans. বাংলা গদ্যভাষা বিকাশে বিদ্যাসাগরের অবদান: ⑨

"কি পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয় বিকিরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টীকা।" – রবীন্দ্রনাথ

মধ্যযুগের কিছু চিঠি পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্যভাষার আদি ও আড়ষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। বাংলা গদ্যভাষার শৈশব তখন আরবী-ফারসীর ভারে চড়ে নিজের পায়ে হেঁটে চলে বেড়াবার অক্ষমতা প্রকাশ করছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের এবং শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায়ের পরিচর্যায় সেই গদ্য কোনরকমে চলনশীল হতে শুরু করেছে। তখন মননমুক্তির আন্দোলন কেবল ডানা বাঁধতে শুরু করেছে। এই পর্বেই বাংলা গদ্যের কোমরে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করলেন মননমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ – রামমোহন রায়। তাঁর হাতে পড়ে গদ্যভাষা তখন যুক্তি-তর্ক-তথ্য ইত্যাদি অস্ত্র সম্ভার বহনের সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। এই গদ্যভাষাকেই বিদ্যাসাগর সেনাপতির রণসাজ পরিয়ে দিলেন। শুরু হলো বাংলা গদ্যের বহুমাত্রিক সাফল্য অর্জনের অভিযান। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) এই অভিযানের এক অন্যতম সেনানায়ক।

একথা ঠিক, বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র সাহিত্য সেবার জন্য কলম ধরেননি। তাঁর নানা-মুখি কর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবেই রচিত হয়েছে বিভিন্ন স্বাদের গদ্য সাহিত্য সম্ভার। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর স্থান, অবদান ও প্রভাব বহুধা বিস্তৃত। আজকের গদ্যভাষার সাবলীল প্রবাহে আশ্চর্যরকম ভাবে মিশে রয়েছেন তিনি। আজ আর তাকে চিহ্নিত করে চেনানো যায়না বলেই তিনি এত সার্থক। বিদ্যাসাগরের আগে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) হাতে বাংলা গদ্যভাষা একটা নির্দিষ্ট মান (Standard) এ উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাকে সাহিত্যিক রূপ দান করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত গদ্যের পথ বেয়েই তাঁর পরবর্তী লেখকগণ যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও সম্প্রদায় এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা গদ্যের পদান্বয় ও যতিবন্ধন এখনও তাঁরই পথ ধরে চলেছে। লোকহিত সাধনে নিষ্ঠ এই মনীষী বাঙালীর মননে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যেই গদ্যচর্চা করেছেন। তাঁর মননশীল ব্যক্তিত্বের চাপে ও তাপে তাঁর শিল্পব্যক্তিত্ব যে সংকুচিত হয়নি, বরং সংহত হয়েছে, রচনা সম্ভারের বৈচিত্র্য ও রস-গভীরতাই তার প্রমাণ।

বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন স্বাদের, বহুবিধ বিষয়ের রচনায় বিদ্যাসাগর নিয়োজিত হয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি সরস্বতীর প্রসাদ প্রার্থনা করেন নি, শিক্ষা ও সমাজের কল্যাণের জন্যই লেখনি চালনা করেছিলেন। কর্মিষ্ঠ পুরুষের কাজের ভাষা রসের ভাষায় কীভাবে পরিণত হয়েছে এবার তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর সুবিস্তৃত রচনা বলিকে আমরা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভাজিত

Scanned by CamScanner

করে নিতে পারি— ক॥ অনুবাদ ও অনুবাদ মূলক রচনা,
খ॥ শিক্ষা মূলক রচনা,
গ॥ সমাজ সংস্কার মূলক রচনা,
ঘ॥ মৌলিক রচনা,
এবং ঙ॥ বেনামি রচনা।

তাঁর প্রতিভা ও গদ্যের সম্পদ বিচারের জন্য আমরা কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট রচনার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত অনুবাদশ্রেণী রচনা হলো "বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)। হিন্দী বেতাল পচ্চীসী'র সরল অনুবাদ। এই অনুবাদ আড়ষ্টতা ও জড়তা মুক্ত নয়। তবে নির্মিতকৌশল সম্পূর্ণ প্রসাদগুণ বর্জিত ও নয়।

বিদ্যাসাগরের অন্যতম অনুবাদ গ্রন্থ 'শকুন্তলা (১৮৫৪) গদ্যকাহিনী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"এ অনুবাদের তুলনা নাই, অভিজ্ঞান শকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুন্তলার বাঙ্গালা তেমনই মধুর।" (বিদ্যাসাগর)।

নাটক যখন গদ্যে বর্ণিত হয় তখন তার প্রত্যক্ষতা চলে যায়। তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের রচনার চরিত্র জীবন্ত; ভাষায় ত্রিপদী ছন্দ ও গীতিমাধুর্য মিলেমিশে এই আখ্যানকে গম্ভীর ও মধুর করে তুলেছে। এই অনুবাদ মূলানুগ হলেও দুরূহতা বর্জিত, স্বচ্ছন্দ গতিতে সাবলীল। 'শকুন্তলা'র ভাষা কোথাও তৎসম শব্দবহুল তবু গম্ভীর মাধুর্যরূপে স্পষ্ট।— "যিনি প্রেষণাপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না;" আবার কোথাও মুখের ভাষায় চলিত রীতির সম্ভাষণ হয়ে উঠেছে— "শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি। আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি।"

'সীতার বনবাস' (১৮৬১) বাংলা গদ্যের ক্লাসিক রীতি ও লিরিক রীতির আশ্চর্য সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে। এখানেও তিনি মূলানুগ। কিন্তু "এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি, এই গিরির শিখর দেশে আকাশ পথে সতত সঞ্চরমান জলধর মন্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত" উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে তৎপূর্বের সমাস সন্ধির শৃঙ্খল। ফুটে উঠেছে প্রত্যক্ষ চিত্ররূপ। যা বর্ণময়। সুষম। এ এক আশ্চর্য বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত। গাঁথনি কোথাও এতটুকু শিথিল নয়। কিন্তু গীতিমুগ্ধ ছন্দের তরলতা স্বতঃসঞ্চারিত।

বিদ্যাসাগর উপন্যাস লেখেননি। শেক্সপিয়রের 'কমেডি অব এররস' অবলম্বনে দেশীয় চরিত্র সংযোগে "ভ্রান্তিবিলাস" (১৮৬৯) লিখেছিলেন। কিন্তু কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্র উপস্থাপনার উপযুক্ত ভাষা যে তাঁরই হাতে নির্মিত হয়েছিল— একথা প্রমাণ করার জন্য মাত্র তিনটি রচনার নাম উল্লেখ করা যায়।—

Scanned by CamScanner

এক ॥ 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯১, মৃত্যুর পর প্রকাশিত), ⑥
দুই ॥ 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৪) এবং
তিন ॥ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা
এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)।

জীবন চরিতের ভাষা সরল, স্বাদু, কাহিনী পরিবেশনের অত্যন্ত উপযোগী।
যেমন— "আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাড়ীতে ছিলেন না;
কোমর গঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব
তাঁহাকে আমার জন্ম সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথি
মধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, একটা
এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।"

পরিস্থিতিবর্ণনার উপযোগী ভাষা—
"তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রী জাতির
শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া
বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না।
দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়…"
[বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া……]

চরিত্র প্রতীষ্ঠার অনুকূল ভাষা—
"যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ
হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান
হইত; সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার
মুখ চুম্বন করিলে, আমার সর্ব শরীর তৎক্ষণাৎ যেন
অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত।"
[প্রভাবতী সম্ভাষণ]

তিনটি নির্দেশনের প্রথমটিতে নির্মল প্রসন্ন কৌতুক, দ্বিতীয়টিতে নৈরাশ্যের জমাট অন্ধকার এবং তৃতীয়টিতে মর্মবিদারী বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর যে কেবল পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন তা নয়, যথার্থ সাহিত্য গুণান্বিত গদ্য রচনায় তিনি অত্যন্ত উচ্চমান তুলে ধরেছেন। অথচ গল্প-উপন্যাস-নাটক লেখেননি একটিও। এর কারন কল্যানও কর্মই ছিল তাঁর একমাত্র আচরিত ধর্ম।

বিদ্যাসাগরের বির্তক মূলক চারটি রচনা (সমাজসংস্কারমূলক)
হলো — # 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ও ২য়)
'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' ১ম ও ২য় (১৮৭১)
এই প্রস্তাবটি মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের বিরল দৃষ্টান্ত। এখানে যুক্তিসজ্জা অভ্রান্ত জ্যামিতিক সূত্রের মত বিন্যস্ত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের যৌক্তিকতা ও আধুনিকতার পিছনে ছিল মানবতাবাদের প্রেরনা।

বেনামি রচনা গুলিতে তিনি নিজেকে আড়ালে রেখে সংস্কারান্ধ সমাজের অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছিলেন। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য', 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' পুস্তিকা গুলিতে ঝাঁঝালো বিদ্রূপ নিক্ষেপিত হয়েছে। হুতোমী ভাষার মত রঙ্গ তাঁর এই আক্রমনে বিরুদ্ধবাদীরা রীতিমত পর্যুদস্ত হতেন। এমন মেঘনাদীয় আক্রমন বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল।

Scanned by CamScanner

বাংলা গদ্য ভাষা রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মৌলিক অবদান ঠিক কোথায়, তা সুনির্দিষ্ট করে করে বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ মিশনারী পণ্ডিতদের আগে বাংলা গদ্যের কর্তা- কর্ম- ক্রিয়া (Subject-Object-Verb সংক্ষেপে SOV) এই বিন্যাস দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মিশনারী সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইংরেজি ঢঙে কর্তা-ক্রিয়া- কর্ম (SVO) লেখা শুরু করেন। রামমোহন কিন্তু পূর্বোক্ত বিন্যাসই অর্থাৎ SOV অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় কর্তা- কর্ম -ক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহার ও রীতিসঙ্গত ছিল না। এখানে বিদ্যাসাগর কেবল ভাষার বোধগম্যতাই সৃষ্টি করেননি, কর্তা- কর্ম -ক্রিয়ার (SOV) বিন্যাস বজায় রেখে তাকে সহজ, সুন্দর ও রসগত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আভিধানগত অর্থের অতিরিক্ত একটি পারিবেশগত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে এক অনন্য ভাবলোক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রবণ গিরি সংলগ্ন প্রদেশের স্নিগ্ধতা ও শীতলতা এবং বৃক্ষচ্ছায়াঘন পরিবেশ পাঠক অনুভব করতে পারেন। আচার্য সুনীতিকুমার একে বলেছেন "অনির্বচনীয় রসবোধ চেতনা", যা বিশুদ্ধ রস সাহিত্যের অন্যতম গুণ।

তৃতীয়ত, বাক্য-পদের অন্বয় সাধন, শব্দের যথোচিত ব্যবহার, আভিধানিক অর্থের ঊর্ধ্বে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি — ইত্যাদি ছাড়াও, আর একটি অবদান সংযোজিত হলো বাংলা গদ্যে, যা এর আগে কোন পূর্বসূরীর রচনায় পাওয়া যায়নি। সেটি হল বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত নিজস্ব ছন্দ (rhythm) আবিষ্কার, তৎসহ প্রবাদ-প্রবচনের সার্থক ব্যবহার।

অর্থানুসারী শব্দের সমন্বয়ে বাংলা গদ্যে স্বাভাবিক ছন্দ প্রবাহিত হতে পারে তা বিদ্যাসাগরই প্রথম দেখালেন। শ্বাসপর্ব (breath pause) এবং অর্থপর্ব (Sense-pause) অনুসারে বাক্যের মধ্যে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবহার করে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি দিলেন। বাক্যের গতি স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল। বিরাম-চিহ্ন ব্যবহার করে দল-ভিত্তিক (Syllable) সমমাত্রিক পর্ব নির্মাণ করে তাতে বাক্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনি ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন।

উনিশ শতকের নির্মীয়মান বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিত তথা মৌখিক রীতি দুটোই প্রচলিত ছিল। তবু বিদ্যাসাগর সাধুরীতি বেছে নিলেন। আলালী বা হুতোমী রীতির ধারে কাছে ঘেঁষলেন না। এর সুস্পষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, আলালী বা হুতোমী গদ্য পরীক্ষামূলক ছিল। কোন সুনির্দিষ্ট সাফল্যের মান তাতে অর্জিত হয়নি। মৌখিক ভাষার লোকায়ত মালিন্য থেকে মুক্ত করে সাধুরীতির সাহিত্যগন্ধী গদ্যভাষাকেই তিনি ভাব প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম মনে করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের ইয়ংবেঙ্গলীয় যুগের হুজুগ থেকে ভাষাকে ও মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। ভাষার মার্জিত, রুচিসম্মত, আভিজাত সত্তাকে গ্রহণ করে তিনি তাকে আরও গতিশীল করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী। নতুন গড়ে ওঠা মনন মুক্তির নবজাগরণে দীক্ষিত হয়ে এবং নেতৃত্ব দিয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বভাবতই সামন্ত সংস্কৃতির বদহাওয়ায় অপরিচ্ছন্ন লোকায়ত ভাষার চেহারাটিকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মত হিউম্যানিস্ট মানুষের পক্ষে মহত্তর ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বৃহত্তর সাধুরীতির ভাষা গড়ে তোলাটাই যুক্তিসঙ্গত নয় কি? নইলে বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিন্যস্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করে তাকে সহজগতি ও উৎকর্ষ-কুশলতা দান করা সম্ভব হতো না। অতএব যুক্তজয়ের যশোভাগ সবার আগে বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য।

Scanned by CamScanner